আমাজনের জঙ্গলে

সুমিতা দাস

(চিকিৎসক, সমাজবিজ্ঞানী)

দক্ষিণ আমেরিকার নদী আমাজন। বিশ্বের বৃহত্তম নদী। পৃথিবীর সমস্ত নদী মিলিয়ে যত জল প্রবাহিত হয় তার এক পঞ্চমাংশ জল প্রবাহিত হয় আমাজন দিয়ে। নদী লম্বায় ৬০০০ কিলোমিটার। চওড়ায় সাধারণ কিলোমিটার খানেক। মোহনার মুখে ১৮০ কিলোমিটার। উপনদী ১১০০টি। তবে উপনদী বললে তাদের বোধহয় অপমান করা হবে। কারণ ওগুলির মধ্যে ৬টি গঙ্গার চেয়ে বড়।

নদী যেমন বড়, তার উপত্যাকাও তেমনি বিশাল। তার মধ্যে ভারতের মতো দুটো দেশ অনায়াসে ধরে যাবে। আর এই আমাজন উপত্যকার বেশিরভাগই হলো অরণ্য। রেনফরেস্ট। এমন ঘন অরণ্য যে সেখানে আলো ঢোকে না। সংবাদপত্রের ভাষায়, বিশ্বের বৃহত্তম কুমারী অরণ্য। অবশ্য অরণ্যটি কুমারী নাকি বহুসন্তানবতী, সেটি আমরা এ লেখায় খুঁজে দেখব।

আমাজনের জঙ্গলকে বলা হয় বিশ্বের ফুসফুস। কারণ ঐ গভীর অরণ্য প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে থাকে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অন্যত্রকার মতো সেখানেও

চলছে জঙ্গল কেটে সভ্যতার পত্তন। আর তাতে প্রমাদ গুণছেন পরিবেশবিদরা। ইউরোপ-এশিয়াতে অরণ্য ধ্বংস করে গ্রাম-নগরের পত্তন হয়ে চলেছে সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই। আফ্রিকার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বেও তাই। ইউরোপীয়রা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে সেখানে নতুন সভ্যতা গড়েছে। এখন ভরসা আমাজন।

আমাজন উপত্যকা সম্পর্কে পুরনো ধারণা এই যে তা একেবারে জনমানবশূন্য না হলেও কাছাকাছি। এই বিশাল জায়গা জুড়ে যে সামান্য মানুষ বসবাস করে তারা ঝুম চাষ করে কোনোভাবে বেঁচে থাকে। বৃষ্টির সময় নদী অনেকটা জায়গা দখল করে নেয়। তাছাড়া এখানকার মাটিও উর্বর নয় যে বেশি ফসল ফলবে। তাই এখানে সভ্যতা, অর্থাৎ গ্রাম-নগরের পত্তন হয়নি।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এ ধারণা সত্যি নয়। আমাজন অরণ্যের ইতিহাস অন্যরকম।

১৫৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আগমনের পর থেকে ইউরোপীয়রা এসে দুই আমেরিকা মহাদেশে নানা অভিযান চালাতে থাকে। অভিযান শব্দটা যত সুন্দর ও পবিত্র শুনতে লাগে, অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্য অবশ্য তত পূতপবিত্র ছিল না। আবিষ্কারের আনন্দ নয়, লুণ্ঠন, বিশেষ করে সোনা লুণ্ঠন ছিল তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য।

সে যাই হোক, সপ্তদশ শতকের গোড়ায় পেরুর ইনকাদের পরাজিত করে প্রচুর সোনা-রুপো লুণ্ঠন করেন ফ্রান্সিসকো পিজেরো। তাঁর সঙ্গী ও তাঁর সৎ ভাই গনজালো পিজেরো এবার (১৬৪১) বেরিয়ে পড়লেন এল ডোরাডোর সন্ধানে— আন্দিজ পাহাড়ের পূর্ব দিকে। ঘন জঙ্গলে পথ চলা। কিছুদিন পর খাবারদাবার শেষ, ঘোড়াগুলো মরে গেছে, এমনকি সঙ্গী হিসেবে যে 'ইন্ডিয়ান'দের পেরু থেকে ধরে আনা হয়েছিল তারাও মৃত। এবার তাঁরা একটি নৌকা তৈরি করে নদীপথে যাত্রা করলেন। চারদিকে ঘন জঙ্গল। জনবসতির চিহ্ন নেই, যেখান থেকে খাদ্য লুঠ করা যাবে। সেই সময় তাঁদের একটা অংশ খাদ্যের সন্ধানে নদীপথ ধরে আরো পূর্ব দিকে রওনা দিলেন।

নদীপথে যারা রওনা দিলেন তারা আর ফেরেন নি। নদী পথে পাঁচ মাস চলে আমাজন ধরে তাঁরা পৌঁছে যান অতলান্তিকে। এই অভিযাত্রীদের নেতা ছিলেন ওরেয়ানা। আর একজন অভিযাত্রী ছিলেন কাবরাহাল, যিনি এই অভিযানের একটি বর্ণনা লিখে গেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন যে নদীর ধারে অনেক মানুষের বাস। তারা গাছের আড়াল থেকে তীর ছোঁড়ে, কখনো আবার নৌকা করে আক্রমণ করে।

"যত এগোই তত দেখি জনবসতি আরো ঘন, জমিও আরো ভালো।... খুব ঘন ঘন গ্রাম, গুলতি ছুঁড়লে এক গ্রাম থেকে তা পাশের গ্রামে গিয়ে পড়বে।.. একদিনে আমরা কুড়িটার বেশি গ্রাম পেরিয়ে গেলাম।... (একটা গ্রাম) পাঁচ লিগের চেয়ে বেশি লম্বা, গায়ে গায়ে লেগে থাকা ঘর।... দূরে বড় বড় শহরও দেখা যাচ্ছে।"

জলপথে যেতে যেতে পাঁচ মাস পরে অতলান্তিকে পৌঁছান তারা। আর বাকিরা, যারা জঙ্গলে থেকে গিয়েছিলেন, তারা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ৬ মাস পরে আধমরা অবস্থায় পেরুতে ফিরে আসেন।

অনেক দিন আর আমাজনের দিকে কোনো ইউরোপীয় অভিযাত্রী যান নি। অনেক পরে যখন ইউরোপীয়রা আবার ওদিকে যান, গ্রাম বা অনেক মানুষজন দেখতে পান নি। তাঁদের চোখে আমাজনের অরণ্য বিশাল এক কুমারী অরণ্য, নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী সেখানে। জীববৈচিত্র্যের সমাহার। কিন্তু সেখানকার মাটি ভাল নয়। আম্লিক। তাতে উর্বরতা নেই। লোকজনও খুব কম। তারা মাছ ধরে আর ঝুম চাষ করে কোনোমতে বেঁচে থাকে। কারভাহালের লেখা বিবরণের কথা বেশি লোক জানতেন না। যাঁরা জানতনে তাঁরা ধরে নেন যে তাঁর বিবরণ বানানো, মিথ্যা।

প্রত্নতত্ত্ববিদরাও আমাজনের অরণ্যে যাননি, ওখানে বিশেষ কিছু পাওয়ার আশা নেই। এমনকি সভ্যতা থাকলেও ওখানে তো পাথর নেই, তাই সভ্যতার চিহ্ন বিশেষ খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। তাছাড়া সবাই জানে, আমাজন হলো কুমারী অরণ্য।

এসব সত্ত্বেও গত শতাব্দীর শেষ দশকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেলেন ছবি আঁকা গুহা— পেন্টেড রক কেভ্স। সানতারেম শহরের কাছে এক বিশাল উপনদী তাহাহোস যেখানে আমাজনে এসে পড়েছে, সেখানে একশো মাইল জুড়ে নদীর জল বছরের বেশিরভাগ সময়েই পনের মাইল চওড়া জায়গা জুড়ে থাকে। জোয়ারের সময় ছোট ছোট দ্বীপগুলোও জলে ডুবে যায়। এখানে ছোট ছোট টিলা ধরনে কিছু পাহাড়ও আছে। এই পাহাড়ের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেলেন প্রাচীন মানুষের আঁকা চিত্র (ভিমবেটকার মতো)। হাত, তারা, ব্যাঙ, মানুষ। অর্থাৎ এখানে মানুষ বাস করত। হয়ত বা তারা বন্যার জল থেকে বাঁচার জন্য এখানে আশ্রয় নিত। এখানে প্রাচীন জঞ্জালের স্তূপে (*মিডেন*) প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁজে পেলেন ১৩ হাজার বছর আগেকার মনুষ্য-সৃষ্ট জঞ্জাল। ১৩ হাজার বছর আগে আমাজন উপত্যকায় মানুষ? সেই সময় তো বেরিং প্রণালী পেরিয়ে মানুষ সবে উত্তর আমেরিকায় এসে আমেরিকার প্রাচীনতম সংস্কৃতি— ক্লোভিস সংস্কৃতি— তৈরি করেছে! কিন্তু এই আশ্চর্যই সত্যি। মানুষ যখন উত্তর আমেরিকায় গুটি গুটি পা রাখছে, প্রায় সেই সময়েই তারা চলে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান ব্রাজিল দেশটিতে, আমাজন উপত্যকায়, সেখানেও তারা বংশবৃদ্ধি করছে। শুধু তাই নয়, এখানেই খুঁজে পাওয়া গেল দুই আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীনতম মৃৎপাত্র, আজ থেকে ৮ হাজার বছর আগেকার।

শুধু মৃৎপাত্রই নয়, আমাজন উপত্যকার মানুষ চাষবাসও শুরু করে দিয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। ৪ হাজার বছর আগে তারা অন্তত ১৩৮ রকম শস্যাদি চাষ করে। প্রধান শস্য ম্যানিওক (বা কাসাভা, বা ট্যাপিওকা)। কচু ধরনের এক কন্দ। তা সেদ্ধ

করে, ভেজে, পুড়িয়ে, গেঁজিয়ে, রুটি তৈরি করে— নানাভাবে খাওয়া যায়। এর জন্য বিশেষ যত্ন লাগে না। সব জায়গায়, সব রকম জমিতে হয়। উৎপাদনও প্রচুর। আজ বিশ্বে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের মধ্যে গম, ভুট্টা ও ধানের পরই স্থান এই শস্যটির।

জঙ্গল কেটে-পুড়িয়ে শস্য চাষ নতুন কিছু নয়। তবে আমাজনের মানুষের খাদ্য উৎপাদনের অন্য উপায়টি কিছু বিচিত্র। যে ১৩৮ রকম শস্যাদির চাষের কথা বলেছি তার অর্ধেকই কিন্তু ঠিক শস্য বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়— গাছ, বৃক্ষ এরকম নামেই আমরা তাদের জানি। জঙ্গলে নিজে থেকে জন্মানো গাছ নয়, মানুষের পোষ মানানো, মানুষের রোপণ করা গাছ। আর তারা মানুষকে খাদ্য দেয়। উদাহরণস্বরূপ একটি গাছের কথা বলি। পিচ পাম। এক গোছা ডাল, সোজা উঠে যায় ৬০-৭০ ফুট। এর যেখান থেকে পাতা বেরোয় সেখানেই হয় গুচ্ছ গুচ্ছ ফল, আমাদের তাল বা নারকেলের মতো। ৬০-৭০ বছর ধরে বছরে একাধিকবার ফল দেয়। হিসাব করে দেখলে একর প্রতি উৎপাদন ধান বা ভুট্টার চেয়ে বেশি। এই ফল আবার দারুন পুষ্টিকরও। ফল ছাড়াও এই গাছে অন্য কিছু অংশও খাওযা যায়। পাম গাছের মতো এরকম গাছ আছে অনেক, ৭০টার মতো। আমাজনের অরণ্যে অনেক জায়গাতেই এই ধরনের মনুষ্য-রোহিত গাছ প্রধান বা প্রায়-প্রধান। তাই, এখানকার অনেক গবেষক বলছেন, আমাজনের অরণ্যকে জঙ্গল না বলে ফলবাগান বলাই যায়। আপনি যদি সে অরণ্যকে জানেন, তবে এই অরণ্যে হারিয়ে গেলেও আপনার খাদ্যের অভাব হবে না।

অরণ্য সাফ করে সভ্যতা গড়ার বদলে অরণ্যের সঙ্গে সহবাসের এ এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। কিন্তু কুমারী অরণ্য নয়, মানুষের হাতে গড়া বাগান-অরণ্য।

বিশেষ করে আমাজনে এটির প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। বৃষ্টি যদি সরাসরি মাটিতে পড়ে তবে মাটির ওপরে অংশ যাকে টপ-সয়েল বলে, সেটা ধুয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু গাছ থাকলে বৃষ্টির জল সরাসরি মাটিতে পড়ে না, গাছে ধাক্কা খেয়ে তারপর টুপটাপ নিচে পড়ে। সেজন্য অরণ্যে এই সমস্যা হয় না, হয় চাষের জমিতে। সাধারণ চাষ না করে গাছ-চাষ করে আমাজনবাসী সে সমস্যার একটা সমাধান করেছিল।

এমনিতেই আমাজনের গভীর অরণ্য সাফ করে চাষবাস করা কঠিন। ঝুম চাষই হোক আর স্থায়ী চাষাবাদ। বিশেষ করে ইউরোপীয়দের আসার আগে তো আমেরিকাবাসী লোহার ব্যবহার জানত না। একটি মোটা গাছ লোহার কুঠারে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেটে ফেলা যায়, কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকাবাসীর পাথরের কুঠারে সে গাছ কাটতে লাগত বেশ কয়েক দিন। এক একর জমি সাফ করতে লেগে যেত বেশ কয়েক মাস। তাতে কয়েক বছর ফসল ফলিয়ে আবার অন্য জমির সন্ধান। খাটনিতে পোষায় না। তাই আজকে গবেষকরা অনেকেই বলেন যে ঝুম চাষ আমাজনে এসেছে ইউরোপীয়দের আসার পর। তার আগে তা ছিলনা। বরং যেটুকু চাষবাস ছিল তা

ছিল স্থায়ী চাষ। কেমন করে? আমাজন উপত্যকার মাটির উর্বরাশক্তি তো নেহাত কম। কয়েক বছর চাষ করলেই তো তা শেষ হয়ে যাবে! এরও একটা সমাধান বের করেছিল আমাজনবাসী। টেরা প্রেটা।

গত শতকের শেষের দশকে আবিষ্কার হয় টেরা প্রেটা—কালো মাটি। আমাজন উপত্যকার মাটি সাধারণত লাল। তার মাঝে কোনো কোনো জায়গা পাওয়া গেল যেখানকার মাটি কালোই শুধু নয়, তাতে ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো মেশানো। দারুণ উর্বর এই মাটিতে বছরের পর বছর চাষ করা যায়। টেরা প্রেটা তৈরি করা হয় হাল্কা আঁচে গাছপালা, জঞ্জাল ইত্যাদি পুড়িয়ে তার সাথে মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরো মিশিয়ে। এভাবে জঞ্জাল পোড়ালে ঐ গাছপালার মধ্যেকার নানা উপদান মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়, আর অন্যদিকে তৈরি হয় কাঠকয়লা, যা এই উপাদানগুলিকে বছরের পর বছর ধরে রাখতে সাহায্য করে। এখনো আমাজন উপত্যকা পুরনো টেরা প্রেটা যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে গড়ে উঠছে কৃষি খামার, যেগুলির উৎপাদন অনেক বেশি। তিন মাইল লম্বা আধ মাইল চওড়া টেরা প্রেটাও পাওয়া গেছে। এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা এখনও এই ধরনের জমি তৈরি করে। পণ্ডিতরা বলছেন, হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ ছিল এ অঞ্চল। সেই সময়ের তুলনায় এ ধরনের জনঘনত্ব বেশ বেশি।

বেশ টেরা প্রেটা না হয় হলো, কিন্তু আমাজনের অরণ্যে যে অনেক জায়গায় অনেক মানুষ বাস করত তা তো প্রমাণিত হলো না! তার প্রমাণও মিলছে। আমাজনের অরণ্য যেখান সাফ করে ফেলা হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে স্থানে স্থানে উঁচু উঁচু জমি (জলের হাত থেকে বাঁচতে)। বলিভিয়ার বেনি থেকে ব্রাজিলের আকরে পর্যন্ত সাতশো মাইল জুড়ে আছে এরকম উঁচু জমি, আর তার পাশে খনন করা খাল, বসবাস করার জন্য উঁচু জায়গা, জলের মধ্যে মাছ ধরার জন্য মাটির জাল, মাইলের পর মাইল উঁচু রাস্তা। দেখা যাচ্ছে নানা জ্যামিতিক আকৃতির— গোল, বর্গাকার— বড় বড় জমি, যার পাশে খনন করা আছে গভীর খাত। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে *জিওগ্রিফ*। ব্রাজিলে আকরে এলাকাতেই এরকম দুশো *জিওগ্রিফ* পাওয়া গেছে। অরণ্য কাটা হলে তবেই এগুলিকে দেখা যায়। তাই মোট কত *জিওগ্রিফ* আছে বলা কঠিন। কিন্তু একটি *জিওগ্রিফ* তৈরি করতেই হাজার হাজার টন মাটি সরাতে হয়েছে, সেটা আবার লোহার হাতিয়ার ছাড়াই। এর থেকে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে এক সময় এই অরণ্যের জায়গায় ছিল গ্রাম ও গ্রামবাসী, যারা এই কাজগুলো করেছে।

আমাজনের অরণ্যের কথা সবাই জানে। কিন্তু আমাজনের অরণ্যবাসীর কথা মূলত অজানা। কুমারী অরণ্যের মিথ মুছে দিলে আমাদের রোমান্টিক চেতনা হয়ত একটু আহত হতে পারে, কিন্তু মানুষের সৃজনশক্তির নতুন নতুন পরিচয়ও কি কম রোমাঞ্চকর!